Deba Prasad Das

আমার কাকা

আমার ছোট কাকা সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে রক্তের সম্পর্কে আমার কাকা তো ছিলেনই , কিন্তু তাঁর সাথে আমার এর চেয়েও বড় যে সম্পর্ক , সেটা গুরু শিষ্যের। সংগীত জীবনে উনি আমার গুরু , আমার প্রিয় আরাধ্য দেবতা। সংগীত জীবনে আজ আমার যা কিছু প্রাপ্তি , যা কিছু নাম যশ, সবই আমার বাবু কাকার আশীর্বাদে। অনেক সৌভাগ্য যে, কৃষ্ণচন্দ্র দে'র মতো ওরকম মানুষকে আমি আমার কাকা হিসেবে পেয়েছিলাম। কাকা তো বিয়ে-থা করেন নি। আমরাই ছিলাম তাঁর ছেলে পুলে , সমস্ত কিছুই। আমাদের যত আবদার , যত নালিশ , যা কিছু চাওয়া, সব চলত এই বাবুকাকার কাছে। আমার বাবা বা মেজো কাকা তো ছিলেন একটু রাশভারী ধরনের লোক। ওদের কাছে আমরা খুব একটা ঘেঁষতে পারতাম না। সবসময় একটা দূরত্ব থেকে যেতো। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাবুকাকা ছিলেন একাধারে আমাদের অভিভাবক, পরম বন্ধু , গুরু, আমাদের সবকিছু। আমি তো একশ বার বলবো যে , রামকৃষ্ণকে না পেলে নরেন্দ্র নাথ যেমন বিবেকানন্দ হতেন না এবং বিবেকানন্দকে না পেলে মার্গারেট নোবল যেমন ভগিনী নিবেদিতা হতেন না , তেমনি সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দেকে কাকা হিসেবে না পেলে কুস্তি লড়া এই দস্যি ছেলে প্রবোধচন্দ্র দে কোন দিনই 'মান্না দে ' হয়ে উঠতে পারতো না।

ছেলেবেলায় কাকা খুব ঘুড়ি উড়াতেন । উনিতো জন্মে ছিলেন এই মদন ঘোষ লেনের বাড়ীতেই । বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে উনি একদিন ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন , হঠাৎ লাটাই ফাটাই ফেলে দৌড়ে নীচে এসে ঠাকুমাকে বল্লেন ," আমার কেমন যেন লাগছে , চোখ দুটো খুব জ্বলছে , যন্ত্রনা হচ্ছে। কেমন যেন সব অন্ধকার অন্ধকার দেখছি। তোমাদের কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। " সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলো" , ওষুধ দেয়া হ'ল, সব কিছু করা হ' ল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার , তা হয়ে গেছে। কাকার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেল চিরতরে। ভাবা যায়, যে মানুষটা দীর্ঘ তের বছর ধ'রে এই পৃথিবীর আলো দেখেছেন ,হঠাৎ তের বছরের মাথায় এক নিমিষে যখন পৃথিবীর সমস্ত আলো তাঁর চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে

গেল , পৃথিবীর সমস্ত রঙ তাঁর চোখে কালো হয়ে গেল, তখন তাঁর মনের অবস্থা কেমন হ'তে পারে ! কিন্তু এই দুর্ঘটনায় কাকা ভেঙ্গে পড়লেন না মোটেও । মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই , এই ভেবে কাকা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন । চোখ গেছে তো কি হয়েছে , আমার কন্ঠতো আর চলে যায়নি । তখনি তিনি ঠিক করে ফেল্লেন যে তিনি গান শিখবেন । অন্ধ হয়ে গেছেন ব'লে কোন রকম হতাশায় ভুগছেন অথবা নিজেকে অন্যের সাহায্য প্রার্থী ভেবে কোন রকম নেতিবাচক ভাবনায় ভুগছেন , এ জিনিষ কোন দিনই কাকার মধ্যে আমি দেখিনি । এসব কথা কোন দিনই তিনি ভাবতেন না । বরং উল্টো , বড় হয়েও আমরা দেখেছি যে তার মধ্যে সবসময় একটা নতুনের খোঁজ চলতো । কী ক'রে জীবনে নতুন কাজ কর্ম করা যায় , কী ক'রে কাজের মধ্যে দিয়ে আর পাঁচ জনের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করা যায় , কী ক'রে নতুন ধরণের গান করা যায় , কী করে গান কে সেই ভালো লাগার পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায় , এই সন্ধানী মন সবসময় তার মধ্যে কাজ করতো । আমিতো বলবো যে অন্ধত্ব তাঁর জীবনে যতটা না অভিশাপ , তার চেয়ে অনেক বেশী আশীর্বাদ । দৃষ্টির জগৎ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলেই হয়তো তাঁর সামনে খুলে গিয়েছিল অনুভূতির অনন্ত জগৎ। এবং সেই তীব্র অনুভূতি বা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উনি জীবনে যা এ্যাচিভ করেছেন, যে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন , সেটা নজীর বিহীন না হলেও কল্পনাতীত ।

কাকা যখন ঠিক করলেন যে তিনি গান শিখবেন ,তখন সংগীত-গত প্রাণ একজন সহৃদয় ভদ্রলোক , যার নাম হরেন্দ্র নাথ শীল, তিনি কাকাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাড়ীতে রেখে বহুদিন ধরে বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে কাকা কে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম দিয়েছিলেন । হরেন্দ্র নাথ শীল ছিলেন জোড়াসাঁকোর স্বনাম খ্যাত বিত্তশালী লোক । উনি নিজে খুব ভালো সুরবাহার বাজাতেন । ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম । হরেন বাবুর বাড়ীতে কাকা তৎকালীন শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রবাদ পুরুষ খলিফা বাদল খাঁ সাহেব থেকে শুরু করে তাবড় তাবড় বহু ওস্তাদের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম পেয়েছিলেন । কাকার ঐ যে নতুনের খোঁজ , জীবনে বড় হওয়ার প্রচন্ড জেদ , তার সাথে ওস্তাদদের তালিম মিলেমিশে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই উনি ব'নে গিয়েছিলেন একজন পরিপূর্ণ শিল্পী । মাত্র আঠারো বছর বয়সে রেকর্ড কৃত তাঁর জীবনের প্রথম গান " অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে " বা " জয় সীতাপতি সুন্দর তনু" শুনলেই বোঝা যায় যে, যে পরিবারে কেউ কোন দিন তেমন ভাবে গান -বাজনাই করেন নি , সেই পরিবারের একটি অন্ধছেলে কতটা ডেডিকেশন থাকলে পর মাত্র পাঁচ বছরের তালিমে ও রকম প্রাণবন্ত গান গাইতে পারে , সেটা সত্যি ভাববার মতো ব্যাপার ! কাকার সে গান মানুষের হৃদয়ে সেদিন কিভাবে নাড়া দিয়েছিল , তার

Deba Prasad Das

জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পেলাম এই কিছুদিন আগে বারাসাতের এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গিয়ে ! সেদিন বারাসাতের এক অনুষ্ঠানে আমি গান গাইতে গেছি। কলকাতা থেকে আসা আরও দু- তিন জন শিল্পীও সেখানে আছেন। আমি অনেক গুলো গান গাইলাম। তার মধ্যে কাকার ঐ বিখ্যাত গান , যেটি কাকার স্মৃতিতে কয়েক বছর আগে আমি ডিস্ক্ করেছি , সেই " অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে " গানটিও ছিল। গান হয়ে যাবার পর আমি মঞ্চের বাইরে বসে একা বিশ্রাম করছি। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন আমার সাথে আলাপ করতে। সেই দিনের অনুষ্ঠান নিয়ে দু- চার কথা শুরু হতেই ভদ্রলোক বেশ বিরক্তি মিশ্রিত রাগত স্বরে আমায় বল্লেন , -" কে এই পোলাপান ! কৃষ্ণচন্দ্র দে , সংগীতাচার্য, তার গান কি পোলাপানে গাইতে পারে ! এরা তেনার গান গাওনের সাহস পায় কোথ্থিকা ! এই ডা পোলাপানের কাম নাকি ! আহাঃ, কেষ্ট বাবুর ঐ গান , ঐ গলা , ঐ ভাব , এই পোলাপানের গলায় কেমন মিনমিন করত্যাসে। " বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধহয় ঠিকমতো চোখে দেখতে পেতেন না, তাই আমিই যে একটু আগে কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া গানের পোলাপান গায়ক, সেটা হয়তো ঠিক বুঝতে পারেন নি। হয়তো শুনেছেন যে আমি কৃষ্ণচন্দ্র দের ভাইপো , তাই আমার কাছেই অভিযোগ জানাতে এসেছেন। কাকার ওরকম শ্রোতার সামনে প'ড়ে আমার তো তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কোন রকমে বল্লাম যে , " আমি ঐ ছেলেটিকে চিনি। সংগীতাচার্যের গান গাইতে আমি ওকে মানা করে দেবো।" তবেই বুঝুন ব্যাপারখানা ! আমি এতদিন গান - বাজনা করার পর এই বয়সে যখন কাকার গান গাই , কাকার গানের শ্রোতাদের কাছে তখনও আমি নেহাৎ পোলাপান !

গান- বাজনার পাশাপাশি নাট্যাভিনয়ের সাথেও কাকা তখন ভীষণ ভাবেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। যতদূর জানি নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের 'বসন্ত লীলা ' নাটকে বসন্ত দূতের ভুমিকাতেই কাকা প্রথম নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হন। বসন্তলীলার পর নাট্যাচার্যের মঞ্চাভিনয়েই বিখ্যাত 'সীতা'নাটকে বৈতালিক রূপী কৃষ্ণচন্দ্রের গাওয়া 'অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে' এবং 'জয় সীতাপতি সুন্দর তনু ' গান দুটো রাতারাতিই বাংলাদেশের মানুষের মন কেড়ে নিয়েছিল। সীতা নাটকের পর নাট্যমন্দির প্রযোজিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সেই বিখ্যাত " চন্দ্র গুপ্ত" নাটক , যাতে চানক্যের ভুমিকায় অভিনয় ক'রে শিশির ভাদুড়ী মহাশয় বাংলা নাটকের ইতিহাসে জীবন্ত কিংবদন্তী হয়ে গিয়েছিলেন , তাতে অন্ধ ভিক্ষুকের চরিত্রে কাকার ঐ রকম জ্বলজ্যান্ত অভিনয় এবং ঐ রকম প্রাণবন্ত উদাত্ত কন্ঠে গীত " ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে। " ও " ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী"গান দুটোও নাট্য সংগীতের ইতিহাসে অমর হয়ে গেছে। খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল কাকার ঐ গান গুলো। তখনো " টকি " অর্থাৎ সবাক ছবি তো শুরু হয়নি , তাই গান গাওয়ার মাধ্যম হিসাবে

থিয়েটারই ছিল তখনকার শিল্পীদের মাস-মিডিয়া। থিয়েটারে গান গেয়ে অভিনয় করে কাকা যখন দু-পয়সা রোজগার করা শুরু করলেন, তখন উনি বড় বড় ওস্তাদদেরকে ভালো সম্মান -দক্ষিনা দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এসে পূর্ণোদ্যমে তাদের কাছে গান শেখাটা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সেই সময় কলকাতায় বসবাসকারী ওস্তাদরা তো বটেই, বাইরে থেকে যারা গান-বাজনা করতে কলকাতায় আসতেন, তাদেরকেও কাকা ধরে ধরে বাড়ীতে নিয়ে আসতেন এবং তাদের কাছ থেকে তালিম হাসিল করতেন।

তখন কার দিনে কলকাতার কয়েকটি বাড়ীতে শাস্ত্রীয় সংগীতের খুব বড় বড় মেহফিল হ'ত। তখনো কনফারেন্স চালু হয়নি। সংগীতপ্রেমী বড় লোকেদের বাড়ীতেই বসতো শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর এবং এইসব আসরের বিভিন্ন নামও ছিল। যেমন শঙ্কর উৎসব, মল্লিক বাড়ীর উৎসব, মুরলী উৎসব, বড়াল বাড়ীর উৎসব ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব মেহফিলে ভারতবর্ষের সমস্ত নামী-দামী গাইয়ে বাজিয়েদেরকে নিয়ে আসা হ'ত বহু টাকা পয়সা খরচ করে অনেকটা যেন প্রতিযোগিতার যোশ নিয়ে। ঐ বাড়ীতে মৈজুদ্দিন এলেন, তো এই বাড়ীতে হাফিজ আলি খাঁকে আনতেই হবে, এরকম একটা ব্যাপার। বড়াল বাড়ীর প্রাণপুরষ লাল চাঁদ বড়ালের ছেলে রাই চাঁদ ছিলেন বাবুকাকার ঘনিষ্ট বন্ধুস্থানীয় লোক। বড়াল বাড়ীর অনুষ্ঠানে তাই বাবুকাকার যাতায়াত ছিল একেবারে ঘরের লোকের মতো। কাজী নজরুল ইসলামও আসতেন সেই সব আসরে। কাকার মুখেই শুনেছি যে, বড়াল বাড়ীর এরকম এক আসরেই নাকি কলকাতায় প্রথম গান গাইতে নিয়ে আসা হয়েছিল সংগীত পটীয়সী মুস্তারী বাঈকে। যাইহোক, কাকা এভাবেই কলকাতার তথা কলকাতায় আগত সমস্ত ওস্তাদদের ধরে নিয়ে এসে তাদের কাছে তালিম নিতেন। কাকা ছিলেন একজন জিনিয়াস। তাঁর স্মৃতিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। একবার কিছু একটা শুনলেই সেটা তাঁর মনে একেবারে গেঁথে যেত। আমরা আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে ওরকম একজন প্রায় লেখাপড়া না জানা লোক শুধু শুনে শুনে কি ভাবে ইংরাজী শিখেছিলেন এবং কিভাবে একেবারে চোস্ত ইংরাজী বলতেন সাহেবী কায়দায়। আমার মনে হয় উনি জিনিয়াস, শ্রুতিধর এসব তো ছিলেনই, সেই সঙ্গে অন্ধ হয়ে যাওয়াতেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, তার মধ্যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিশ্চয় কাজ করতো। হয়তো কাকা গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছেন, তখন হয়তো প্রভাস পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কাকা ঠিক বলে দিতেন, "কে ভেলু?" আবার একটু পরে হয়তো আমি যাচ্ছি, তখনো কাকা ঠিক বলে দিতেন, "কে যায় মানা?" সে কারণেই আমার ধারণা যে, কাকার মধ্যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিশ্চয় কাজ করতো।

প্রচলিত একটা কথা আছে-"যত দিন বাঁচি, ততদিন শিখি।" এর বাস্তব রূপ ছিলেন আমার কাকা। লোকে তাকে আচার্য, পণ্ডিত এই সব

অতি সম্মানণীয় আখ্যায় ভূষিত করলেও এইসব নিয়ে তাকে কোন দিন মাথা ঘামাতে আমরা দেখিনি , বরং নিজেকে সংগীতের একজন ভালো ছাত্র হিসেবে ভাবতেই তিনি ভালোবাসতেন। '' আমি অনেক জেনে গেছি , শিখে গেছি আর কি শিখব'' এধরণের মনোভাব কোনদিন তারমধ্যে আমি দেখিনি। এত সংগীত কোবিদ , এত প্রথিতযশা গাইয়ে ছিলেন উনি, কিন্তু একজন আনকোরা গাইয়ের জন্যও তার সেকি সম্ভ্রম , কি শ্রদ্ধা ! যখনি যার মধ্যে ভালোকিছু দেখেছেন , তাকে আপ্যায়ন করে বাড়ীতে এনে তার সেইসব ভালো ভালো জিনিষ গুলো তিনি যেভাবে একেবারে ছোট ছাত্রের মতো করে শিখতেন , তখন কে বলবে যে এই ছাত্রটিই বিখ্যাত গাইয়ে কৃষ্ণচন্দ্র দে। শিখবার সময় একেবারে ছাত্রটি হয়ে যেতেন তিনি , আমাদেরকেও সবসময় বলতেন,''মনে রেখো , জীবনে শেখবার কোন শেষ নেই। যেখানেই ভালো কিছু দেখবে ,অমনি সেটা নিজের করে নেবার চেষ্টা করবে। তাহলেই দেখবে জীবনে তুমি অনেক বড় হতে পারবে। গুরু হচ্ছে তুলসী পাতার মতো। এর কোন জাত নেই, বয়স নেই। তুলসী পাতা তুলসী পাতাই। তার আবার ছোটবড় কি !'' আর বলতেন -'' সব সময় ভাল সঙ্গ কর। ভাল সঙ্গের একটা সুফল তুমি পাবেই পাবে।'' বলতেন , -''দেখো, ফূলমেঁ যো কীড়ে হোতে হ্যাঁয়, ফূলকে সাথ বো ভী দেবতাকে সির পর চড় যাতে হ্যাঁয়।'' কাকা এসব কথা যে শুধু উপদেশ দিতেন তাই নয় , তিনি মনে প্রাণে সেগুলো বিশ্বাস করতেন এবং মানতেনও।

সারা ভারতবর্ষে যখন কাকার নাম ছেয়ে গেছে,যখন তাঁর গাওয়া যে কোন গানের রেকর্ড হট কেকের মতো বিক্রী হ'ত , তখনও এই ছাত্র সুলভ মনোভাবের কোন হেরফের হতে আমি দেখিনি। একবার আমার মনে আছে , আমার ছোট ভাই প্রভাসকে নিয়ে উনি প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন , ''কোত্থেকে কীর্ত্তনের আওয়াজ ভেসে আসছে ? কে গায় এত সুন্দর কীর্ত্তন ?'' প্রভাসকে বল্লেন,-''যাওতো ভেলু , দেখে এসো কে গায় এমন সুন্দর গান।আর তার ঠিকানাটাও নিয়ে আসবে।'' ক'দিন পরেই সেদিন সকালের সেই কীর্ত্তন গায়ক বংশীধারী চট্টোপাধ্যায়কে কাকা বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। বল্লেন ,-'' সেদিন সকালে ওদিক দিয়ে যেতে যেতে আপনার গান শুনলাম। আহা কি সুন্দর কীর্ত্তন গান আপনি ! আমি আপনার কাছে কীর্ত্তন শিখব।'' কাকার প্রস্তাব শুনে বংশী বাবুর তো লজ্জায় একেবারে মাথা হেঁট। বংশীবাবু ভাবতেই পারছিলেন না যে কীর্ত্তনীয়া রাধারামন বাবু এবং নবদ্বীপ ব্রজবাসীর সুযোগ্য শিষ্য ভারত বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে কীর্ত্তন শিখতে চাইছেন কিনা তাঁর মতো অনামী গায়ক বংশী চট্টোপাধ্যাযের কাছে। এ যে অসম্ভব ! কি করে ভাববেনই বা বংশীবাবু !'' ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বধূ,'' '' শুন শুন হে পরাণ প্রিয়া,'' ''নবদ্বীপের শোভন '' '' লোকে বলে কালো, কালো

Deba Prasad Das

নয় সখী" " আমি অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া " ইত্যাদি বিখ্যাত কীর্ত্তনের গায়ক হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম যে তখন বাংলাদেশের প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরছে। সেই কৃষ্ণচন্দ্রকেই কিনা কীর্ত্তন শেখাতে হবে তাকে , এযে দিঘির কাছে সাগরের জল চাওয়ার মতো কল্পনাতীত ব্যাপার। কিন্তু কাকাও ছাড়বার পাত্র নন, ওঁর মধ্যে যেটুকু ভালো আছে , সেটা কাকাকে যে শিখতেই হবে। শেষ পর্যন্ত কাকার পীড়াপীড়িতে বংশীবাবু বাধ্য হয়েছিলেন কাকাকে কীর্ত্তন শেখাতে। এমনই ছিল কাকার শেখবার অদম্য আগ্রহ।

কাকাকে দেখে দেখে আমার মধ্যেও সে জিনিষটা কিছু কিছু এসে গেছে। ভালো কিছু শুনলেই সে জিনিষটা নিজের করে নেবার একটা তাগিদ সবসময় আমি অনুভব করি। আমাদের বাড়ীতে আমার মতো রেডিও কেউ শুনত না। খুব রেডিও শুনতাম। দেখতাম জানা অজানা কত বিভিন্ন শিল্পী কত বিভিন্ন ধরণের গান গাইছে এবং প্রত্যেকের মধ্যেই কত বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রোচ , কত নতুনত্ব। কাকার মতো আমিও খুব চেষ্টা করতাম তাদের সেই নতুনত্ব, তাদের সেই ভালো ভালো জিনিষ গুলো আমার নিজের গানের মধ্যে ইনকরপোরেট করে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে। দেখেছি এতে আমার গানের ভালো বৈ মন্দ কিছু হয়নি। গান বাজনায় সবসময় একটা গ্রহণেচ্ছু মন থাকা একান্ত দরকার , মনের এই রিসেপটিভিটি না থাকলে শুধু গান বাজনায় নয়, জীবনের কোন ধারাতেই কেউ কোনদিন বড় হতে পারে না।

কাকা ছিলেন একজন ভার্সেটাইল সিঙ্গার , বহুমুখী গায়ক। সংগীতের এমন কোন ধারা নেই , যে ধারার গান উনি গাননি। ধ্রুপদ , ধামার , খেয়াল থেকে শুরু করে আধুনিক , রবীন্দ্র সংগীত , কীর্ত্তন, গজল সমস্ত কিছু উনি গাইতে পারতেন। শুধু যে গাইতে পারতেন , তাই নয় , যখন যেটা গাইতেন , একেবারে কমান্ড নিয়ে গাইতেন। কলকাতার আসরে যখন তিনি রীতিমতো একজন প্রতিষ্ঠিত খেয়ালিয়া , তখন একদিন কার সাথে ধ্রুপদ নিয়ে কি যেন একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল। কাকাতো গাইতেন মূখ্যত খেয়াল। তাতেই বোধহয় কেউ মন্তব্য করেছিল , " কেষ্ট বাবু আবার শাস্ত্রীয় সংগীতের তেমন কি বোঝেন। উনিতো গান খেয়াল , আসল শাস্ত্রীয় সংগীত তো হচ্ছে ধ্রুপদ ধামার।" মন্তব্যটা সেদিন কাকাকে এত আঘাত দিয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললেন যে তিনি ধ্রুপদ শিখবেন। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। পরদিনই বাড়ীতে নিয়ে এলেন ধ্রুপদীয়া ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবকে এবং বিখ্যাত পাখোয়াজী সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কে , দানী বাবু নামেই যিনি বাংলাদেশে একডাকে পরিচিত ছিলেন। শুরু হয়ে গেল কাকার ধ্রুপদ শিক্ষা। আমরা দেখলাম শিক্ষা কাকে বলে। দিন রাত কাকার সেকি অক্লান্ত পরিশ্রম। দানী বাবু পাখোয়াজ বাজাচ্ছেন। দবীর খাঁ তালিম দিচ্ছেন। কাকা গাইছেন ,- সে এক দেখবার মতো ঘটনা। এটা ঘ'টেছিল

আমি একটু বড় হবার পর। তাই কাকার দেখাশোনা করা, বন্ধেজ লিখে নেওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য তখন ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকেও সেখানে কাকার পাশে পাশে থাকতে হ'ত। কাকা একবার ঠিক করলেন, অনেক ধরণের গানই তো গাওয়া হ'ল, এবার একটু "নাৎ" গান গাওয়া যাক। ইসলাম ধর্মে পয়গম্বরদের প্রশস্তি করে উর্দুতে যে সব গান গাওয়া হয়, তাকে বলে "নাৎ"। কাকা ঠিক করলেন সেই নাৎ গাইবেন। একজন বাঙ্গালীর পক্ষে নাৎ গান গাওয়া শুধু যে কঠিন, তাই - নয়, বলা যায় প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রথমত তো পয়গম্বরদের প্রশস্তি, তায় আবার উর্দুতে। একটু ভুল হলেই আর রক্ষে নেই। কিন্তু মাথায় যখন একবার এসেছে, যত কষ্টই হোক 'নাৎ' তাকে শিখতেই হবে। অনেক চেষ্টা ক'রে কিছুদিনের মধ্যেই কাকা একজন ভালো উর্দু শিক্ষককে খুঁজে বের করলেন, তাকে উর্দু শেখানোর জন্য। তাঁর নাম ছিল সৈয়দ সাহাব। অত্যন্ত ভালো লোক ছিলেন তিনি। ভালো লোক মানে, কি বলবো, উনিতো এসেছিলেন কাকাকে উর্দু শেখাতে, কিন্তু যখন দেখলেন যে ওরকম একজন অত্যন্ত গুণী মানুষ, কারো সাহারা ছাড়া এখানে ওখানে একপা - ও চলতে পারেন না, তখন স্বেচ্ছায় উনি হয়ে গিয়েছিলেন কাকার সর্বক্ষণের তল্পিবাহক। সৈয়দ সাহাব আসার পর থেকে কাকার কোন কাজই আমাদেরকে করতে হ'ত না বল্লেই চলে। এমন কি কলকাতার বাইরে দিল্লী, বম্বে যেখানেই কাকা অনুষ্ঠান করতে যেতেন, সেই সময় সর্বত্র কাকার সাথে সাথে যেতেন এই সৈয়দ সাহাব। আমাদের কেও খুব ভালো বাসতেন উনি। এমন হয়ে গিয়েছিল যে ওঁকে আমরা আমাদের বাড়ীরই একজন বলে ভাবতাম তখন। আজ যখন থেকে থেকে হিন্দু -মুসলমানের দাঙ্গায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে মাতৃভূমি, তখন সৈয়দ সাহাবদের মতো মানুষের অভাবটা ভীষণ ভাবে বুকে এসে বাজে। যাই হোক, সৈয়দ সাহেবের সাথে সবসময় উর্দুতে কথা বলতে বলতে অল্পদিনের মধ্যেই কাকা এত চোস্ত উর্দু বলতে লাগলেন এবং এতো নিখুঁত "নাৎ" গাইতে লাগলেন যে উর্দুভাষী কট্টর মুসলমানরা পর্যন্ত সর্বসমক্ষেই স্বীকার করতেন যে, - "বাঃ বাঃ ক্যা বাত হ্যাঁয়, কিতনী আচ্ছি উর্দু বোল লেতে হ্যাঁয় আপ! কিতনা বেহতরিন নাৎ গাতে হ্যাঁয় আপ।" ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে বহুবার। আমাদের কাকাকে লোকে এত প্রশংসা করছে, শুনে শুনে গর্বে আমাদের বুক ভ'রে উঠত। এসব ঘটনায় কাকার সাথে সাথে আমাদেরও একটা ভীষণ শিক্ষা হয়ে যেত। দিনরাত সৈয়দ সাহেব এবং কাকার উর্দু কথপোকথন শুনতে শুনতে উর্দু উচ্চারণের যেটা খাসিয়ত্ অর্থাৎ স্পেশালিটি, সেই খাসিয়ত্টা আমাদের বিনা পরিশ্রমেই শেখা হয়ে যেত। যেমন কিছু কিছু শব্দ "গ়জল", "নজ়ম", "কয়ামৎ" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের বাঙ্গালীদের যে উচ্চারণের ধারা, তাতে সেগুলো উচ্চারণ করা খুব কষ্টকর। আমরা বল্লেই ওটা হয়ে যাবে 'গজল', 'নজম',

Deba Prasad Das

ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ সর্বভারতীয় গান-বাজনার ক্ষেত্রে নাম করতে হ'লে এই উচ্চারণের ক্ষেত্রে খুবই নিখুঁত হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে বাধ্য যে বাঙ্গালীদের হিন্দী -উর্দু উচ্চারণের শুদ্ধতা খুবই নিম্নমানের। এমন কি বাংলার যে সব শিল্পীরা এককালে হিন্দীগান গেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন , তাদের উচ্চারণের শুদ্ধতাও সব ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত নয়। কিন্তু কাকা এসব ব্যাপারে সবসময় খুব সজাগ থাকতেন। এবং কাকাকে দেখে দেখে, কাকার উর্দু কথা শুনে শুনে আমিও এব্যাপারে তখন থেকেই খুব সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম। পরবর্তীতে বম্বে গিয়ে হিন্দী-উর্দু গীত-গজল গাওয়ার সময় এগুলো আমার খুব কাজে লেগেছিল।আমার হিন্দী গান শুনে হিন্দী ভাষীরা বলে , - " আপ ইতনা বেহতরীন হিন্দী গানা ক্যায়সে গা লেতে হ্যাঁয় !" আমি বলি , " কেন গাইব না I want to do my best . Because I know , it is my bread and butter ". হয়তো মেহেদী হাসান বা গোলাম আলির মতো চোস্ত উর্দু আমি এখনো বলতে পারিনা , হয়তো মুকেশ বা রফির মত চোস্ত হিন্দী এখনো আমি সেভাবে বলতে পারিনা , কিন্তু খুব চেষ্টা করি শুদ্ধ উচ্চারণ করে গানটাকে অন্তত সেই পর্যায়ে পৌঁছে দিতে। হিন্দী বা উর্দু ভাষীরা আমার সেই সফল প্রচেষ্টার কদর করে থাকেন।

এই শতাব্দীর দু-এর দশকে নির্বাক যুগ পেরিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবে যখন সবাক যুগের সূচনা হ'ল , সেই সময় গায়কদের মান মর্যাদা হঠাৎ এক লাফে খুব বেড়ে গিয়েছিল। কারণ তখন তো এখন কার মতো প্লে-ব্যাক ব্যবস্থা চালু হয়নি , তাই ছবিতে যিনি নায়ক হতেন , পেশাগতভাবে গায়ক হওয়াটা তার পক্ষে একটা অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করতো। সেই কারণেই আগেকার দিনে দেখা যেত যে পেশাদার প্রত্যেক গায়কই গানের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের অভিনেতাও হতেন। সেই পটভূমিতেই উঠে এসেছিলেন চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়ক তথা বিখ্যাত গায়ক কুন্দন লাল সায়গল এবং আরো অনেকে। সেই একই পটভূমিতেই আমার কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে'র ও অভিনয় জীবনের শুরু। যতদূর জানি ১৯২৮ সালে দেবকী বসু পরিচালিত নিউথিয়েটার্সের "চন্ডিদাস " ছবিতেই কাকা প্রথম চলচিত্রাভিনয় করেছিলেন। এই ছবির নাম ভূমিকায় ছিলেন সেদিনের ম্যাটিনি আইডল দূর্গাদাস ব্যানার্জী , রামীর ভূমিকায় ছিলেন তখনকার দিনের বিখ্যাত নায়িকা উমাশশী এবং সুদামের ভূমিকায় অভিনয় করে ছিলেন আমার কাকা। এই ছবিতে সুদামের লিপে কাকার গাওয়া রাইচাঁদ বড়ালের সুর তথা সৌরীন্দ্র মোহন মুখার্জীর লেখা গান , - " ফিরে চল , ফিরে চল আপন ঘরে " রাতারাতি বাংলাদেশে ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল কাকার সেই গান। রামীর লিপে উমাশশীর গাওয়া একটি গান -"মরিব মরিব সখী "ও সে সময় খুব হিট করেছিল। যতদূর জানি এটিই প্রথম ভারতীয় ছবি যাতে আবহসংগীত ব্যবহার করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে বলব যে "চণ্ডিদাস" ছবিটি

দুর্গাদাস, উমাশশী এবং কাকার তো বটেই , নিউথিয়েটার্সেরও একটা মস্ত টার্নিং পয়েন্ট। 'চন্ডিদাস ' হিট হবার পর , বিশেষত ঐ''ফিরে চল,ফিরে চল '' গান টি অত্যন্ত জনপ্রিয় হবার পর অভিনেতা হিসেবেও বাংলা চলচিত্রে কাকার আসন পাকা হয়ে গিয়েছিল। সেই সুবাদেই মধুবোসের '' রাখী '', এ্যাসোসিয়েটেড প্রোডাকশনের ''আঁধি'',নীতিন বোসের '' দেশের মাটি'', ''ধূপছাঁও '', ''ভাগ্যচক্র'' ইত্যাদি বহু ছবিতে কাকা তখন অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া ''পূরবী'', '' দেবদাস '' , '' আলোছায়া '' প্রভৃতি ছবিতেও তাঁর গান ও অভিনয় সারা বাংলাদেশে তখন সাড়া ফেলে দিয়েছিল। যতদূর মনে পড়ছে ১৯৩৫এ মুক্তি প্রাপ্ত '' ভাগ্যচক্র'' ছবিতেই এদেশে প্রথম প্লে ব্যাক প্রথার প্রচলন হয়।

আমরা একটু বড় হবার পর যখন কাকার সাথে স্টুডিও পাড়ায় নিয়মিত· যাতায়াত শুরু করেছিলাম , তখন ভেবে আশ্চর্য হয়ে যেতাম যে দুর্গাদাস ব্যানার্জী , পঙ্কজ মল্লিক এদের পাশাপাশি একজন অন্ধলোক কি ক'রে এত স্বতঃস্ফূর্ত , এত সাবলীল অভিনয় করছেন ! কাকার অভিনয় দেখলে একবারও মনে হ'ত না যে একজন অন্ধ লোক অভিনয় করছেন। কাকা তো চোখে দেখতে পেতেন না,পরিচালক শুধু সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিতেন , কে কোথায় আছেন, বলে দিতেন। ব্যাস, সেইটুকু শুনে নিয়ে তাঁর ঐ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সিচুয়েশনটা দেখে নিয়ে উনি এত নিখুঁত ভাবে সেই চরিত্রে অভিনয় করে দিতেন ,এত নিখুঁত ডায়ালগ বলতেন , এত নিখুঁত চলাফেরা করতেন যে, কোথাও এতটুকুও ভুল হ'ত না কোন কিছুতে । আর শুধু কি অভিনয় ,অভিনয় ক'রে ক'রে গান গাওয়া , ছবির সংগীত পরিচালনা করা , সবকিছু। আমি নিজে এই প্রফেশনে যুক্ত আছি বলেই আজ বলতে পারি যে তিনি কি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন সেদিন। একবার আমার মনে আছে , কি একটা ছবির জন্য যেন উনি আবহ সংগীত তৈরী করেছিলেন। শুনে পরিচালক বল্লেন ,- ''কেষ্টবাবু এটা যেন একটু কেমন হয়ে গেল ''। ব্যাস , কাকা বাতিল করে দিলেন এতকষ্ট করে তৈরী করা সমস্ত সুর , সিচুয়েশনটা আবার ভালোভাবে শুনে নিয়ে ঐ বসে বসেই এমন সুর করেছিলেন যে পরিচালক বিস্ময়ে একেবারে হতবাক।

কাকার কথা বলতে গিয়ে ছড়ানো ছিঁটানো কত ঘটনাই না আজ একে একে মনে পড়ছে। কাকা তখন আকাশবাণীর নিয়মিত শিল্পী। যতদূর মনে পড়ছে '' আকাশবাণী'' নামটা তখনও চালু হয়নি। ইন্ডিয়ান ব্রড কাষ্টিং কোম্পানী নামেই তখন সেটা পরিচিত ছিল। এর অফিস ছিল ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসে। কাকা রেগুলার সেখানে প্রোগ্রাম করতে যেতেন। তখন আকাশবাণীতে আজকের মতো এত কড়াকড়ি ছিল না। শিল্পীরা আকাশবাণীকে তাদের নিজের বাড়ীর মতোই মনে করতেন। এমনকি অনেক বাড়ীর ভালো ভালো গানের অনুষ্ঠানও সরাসরি আকাশবাণী থেকে তখন প্রচার করা হ'ত। আকাশবাণীতে কাকা গান গাইতে যেতেন। কাকা তো বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতেন সারাদিন। হয়তো কালি ফিল্মস্ বা

নিউ থিয়েটার্স থেকে ফিরলেন। ফিরেই কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে আমাকে বলতেন ,-" মানা খাতা থেকে একটা গান প'ড়ে দাও তো। " আমি প'ড়ে দিতাম । গান পড়তে পড়তেই তাঁর কাপড় পড়া হয়ে গেল। বাইরে গাড়ী দাঁড়ানো। উনি চলে গেলেন রেডিও স্টেশনে।তারপরে আধ ঘন্টা পরেই শুনতাম রেডিওতে কাকা গাইছেন আমার প'ড়ে দেওয়া সেই বিখ্যাত গান , - "ক্যা কারণ হ্যায় অব রোনেকা " কিংবা "পন ঘট পে কান্হাইয়া আতা হ্যায়" ইত্যাদি ইত্যাদি। টেপ রেকর্ডারের প্রচলন না হওয়ায়, তখন সব প্রোগ্রামই আকাশবাণী থেকে লাইভ সম্প্রচারিত হ'ত। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে হয়তো সময়ের অভাবে গানটা বাড়ীতে আমাদেরকে দিয়ে উনি পড়িয়ে নিতে পারলেন না,তখন সঙ্গে করে আমাকে কিম্বা আমার বড়দা প্রণব দেকে নিয়ে যেতেন রেডিও স্টেশনে। স্টুডিওতে বসেই কাকার কানের কাছে খুব নীচু গলায় আমি গান প্রম্প্ট্ করতাম এবং তাই শুনে শুনে কাকা গেয়ে দিতেন। তখনও রেডিওতে সময়ের এত কড়াকড়ি ছিল না , তাই তিন মিনিটের গান পাঁচ মিনিট গেয়েদিলেও কোন ঝামেলা হ'ত না। সমস্যা হ'ত গ্রামাফোনে রেকর্ড করার সময়। রেকর্ডের তো একটা নির্দ্দিষ্ট সময়সীমা থাকে।তার মধ্যেই শিল্পীকে গান শেষ করতে হয়। কিন্তু কাকাতো ছিলেন অন্ধ মানুষ। ঘড়ি দেখা বা সময় নির্দেশক সবুজ আলো, লাল আলো দেখতে পাওয়ারও কোন প্রশ্নই উঠতনা। তখন হ'ত কি , সবুজ আলোটা জ্বলে উঠলেই কাকার কোমরের কাছটায় আমি হাত দিয়ে একটু চাপ দিয়ে দিতাম। কাকা বুঝতেন সবুজ আলোটা জ্বলে গেছে , উনি গান শুরু করে দিতেন। তারপর এক মিনিট হয়ে গেলেই কাকার ঘাড়ের ডানদিকটায় আমি আঙ্গুল দিয়ে একটা টোকা দিয়ে দিতাম। যখন দু -মিনিট হয়ে গেল , কাকার ঘাড়ের বাঁদিকে দুটো টোকা দিয়ে দিতাম। যখন তিন মিনিট হ'ল, কাকার কোমরে কাছটায় তখন পর পর এক দুই তিন ক'রে তিনটে টোকা মারতাম।তারপর তিন মিনিট পনের সেকেণ্ড হয়ে গেলেই আমরা কাকার কোমরে দু - হাত দিয়ে চেপে ধরতাম। অর্থাৎ লাল আলো জ্বলে গেছে , আর গান নয়। কাকা থেমে যেতেন। তবে বেশীর ভাগই ঐ পনের সেকেণ্ড নির্দেশক চাপটা আমাকে আর দিতে হ'ত না। তার আগেই উনি গান থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, - " কি মানা , কত হ'ল, তিন - চোদ্দ ?" দেখতাম ঘড়িতে তখন ঠিক তিন মিনিট হয়ে চোদ্দ সেকেণ্ড ।

রেডিওর প্রসঙ্গেই মনে পড়ে গেল আরও একটি ঘটনার কথা। এ ঘটনা থেকে মানুষ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনের অন্য একটি দিক হয়তো আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। পরে বড় হয়ে বাড়ীরই কারো মুখে হয়তো ঘটনাটা আমি শুনেছিলাম। এমনিতেই কাকাকে তো আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম , কিন্তু এই ঘটনা শোনার পর তাতে যেন অন্য আর একটি মাত্রা যোগ হয়ে গিয়েছিল। সেদিন কাকা রেডিওতে গান গাইতে গেছেন। তানপুরা ,তবলা

সব কিছু বেঁধে মাইক্রো-ফোনের সামনে যাবার জন্য একেবারে প্রস্তুত, এমন সময় তার কানে এল কে একটা মেয়ে আদুরে গলায় কাকে যেন বলছে,- " বাবুজী , মুঝে ভি রেডিও পর কুছ গাওয়া দিজিয়ে না "। শুনেই উনি সঙ্গের কে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন ,-" মেয়েটিকে ? কাকে বলছে রেডিওতে গাইয়ে দিতে ? " কে একজন বল্লে ,-" উনি মুস্তারী বাঈ । রাইবাবুর সাথে এসেছেন আকাশবাণী দেখতে। এসে আপনাকে দেখে ওরও রেডিওতে গান গাইতে খুব ইচ্ছে করছে।সে কথাই অনুনয় করে রাইবাবুকে বলছেন ।" কাকা রাইবাবুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ,-" কি রাইবাবু , বাঈ কী বলছে ? গান গাইতে চান বুঝি রেডিওতে? " রাইবাবু বল্লেন , - " হ্যা, সে কথাই তো বলছেন। কিন্তু গাওয়াই কি করে ! আপনার প্রোগ্রাম যে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে।"কাকা বল্লেন , -" আরে রাইবাবু, আমার গান তো রেডিও থেকে আকছারই হচ্ছে। শ্রোতারা তো সবসময় শুনছেন আমার গান। আমার গান পরেও তাঁরা বহু শুনতে পারবেন কিন্তু মুস্তারীবাঈ কে সবসময় পাওয়া যাবে না। তিনি নিজে থেকে গাইতে চাইছেন , এতো আমাদের পরম সৌভাগ্য। আজ উনি গান করুন , আমরা সবাই শুনে ধন্য হই। কাকার বাঁধা তানপুরা -তবলা নিয়ে শেষ পর্যন্ত মুস্তারীবাঈয়ের গানই হয়েছিল সেদিন । এযুগে তো প্রশ্নই ওঠে না ,সে যুগেও বোধহয় এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কাকার মতো ওরকম ভদ্র , মার্জিত, উদার, শিল্পীসুলভ মনোভাব আমার এই দীর্ঘ জীবনে আমি খুবই কম দেখেছি।আরও স্পষ্ট করে বললে ,- সেরকমটা আর কারও মধ্যেই দেখিনি বললেই চলে।

কাকা একবার ঠিক করলেন যে উনি রবীন্দ্রসংগীত গাইবেন ।তখনও 'রবীন্দ্রসংগীত' বলে আলাদা কিছু হয়নি। লোকে 'রবিবাবুর গান' বা রবিঠাকুরের গান বলেই এ গানকে জানতো। কাকা ঠিক করলেন রবিবাবুর গান গাইবেন। এখানে একটা কথা বিশেষ করে বলা দরকার যে , ঐ যে 'রাবীন্দ্রিক ঢঙ্' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে , কাকা সেটা একেবারে পছন্দ করতেন না। বলতেন ওটা আবার কি ঢঙ্ ! গানের মধ্যে ওসব আবার কি ন্যাকামি করা ! এই সব বিকৃতি কাকা একদম সহ্য করতে পারতেন না। রবীন্দ্র সংগীতের সুরও যে কাকাকে তেমন ভাবে আকৃষ্ট করতো, তেমন নয়। কিন্তু রবীন্দ্র সংগীতের কথা , আহাঃ ! কাকা খুব পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথের লেখা। বলতেন , -'ঐ রকম গান বাংলা দেশে কোন দিন লেখাই হয়নি। হয়তো হবেও না আর কোনদিন।' তাঁর জন্য যারা গান লিখতেন , যেমন শৈলেন রায় ,হেমন্ত গুপ্ত , হেমেন্দ্র কুমার রায় , মোহিনী চৌধুরী ওঁদেরকেও খুব বলতেন, ' এই রকম যে ভাবনা , এই রকম যে শব্দ প্রয়োগ, এই যেমন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন , এই রকম গান তোমরা কেন লিখতে পারনা ! ' যাই হোক শেষ পর্যন্ত কাকা HMV থেকে রবীন্দ্র -সংগীতেরও একটি রেকর্ড (P-11782) করেছিলেন এবং সে রেকর্ড দারুণ বাজারও পেয়েছিল। সম্ভবত সেটা রবীন্দ্রনাথ মারা

যাওয়ার চার- পাঁচ বছর আগের ঘটনা। রেকর্ডের একপিঠে ছিল, ''আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে '' এবং অন্য পিঠে ছিল -' আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে।' এরও প্রায় আরও বছর দশেক পরে ১৯৪৮ সাল নাগাদ মুক্তিপ্রাপ্ত ''দৃষ্টিদান '' ছবিতেও কাকা দুটো রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলেন। গান দুটো ছিল - '' তোমরা যা বল তাই বল'' এবং '' হে মহাজীবন, হে মহা মরণ।'' রেকর্ড নম্বর P-11891। বলাবাহুল্য কাকা অবশ্যই তথাকথিত রাবীন্দ্রিক ঢঙে সেই রবীন্দ্রসংগীত গুলো গাননি। কিন্তু শুনেছি প্রথম রেকর্ডটি শুনে রবীন্দ্রনাথ খুবই সুখ্যাতি করে ছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে মুষ্টিমেয় যে কয়খানি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড সংগৃহীত ছিল,তার মধ্যে কাকার গাওয়া রবীন্দ্র সংগীতের প্রথম রেকর্ডটিও নাকি স্থান পেয়েছিল।

কাকার গান কেন এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, কেন আর সকলকে ছাড়িয়ে ''কানাকেষ্ট'' নামটাই সেদিন লোকের মুখে মুখে ফিরতো,এ নিয়ে ভাবতে গিয়ে এবং আমার নিজের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় কাকার জনপ্রিয়তার কিছু কিছু কারণ আমার মনে এসেছে। অন্যদের চিন্তাভাবনার সাথে আমার ধারণা নাও মিলতে পারে। সংগীত নিয়ে চুলচেরা বিচার করার অধিকারী আমি নই, ইচ্ছেও নেই। তবু দীর্ঘদিন কাকার সাথে থেকে, তাঁর গান বাজনা শুনে শুনে আমার যেটা মনে হয়েছে, সেটাই এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। কি এ যুগে, কি সে যুগে, যে কোন যুগেই বহুমুখী গায়কের সংখ্যা খুব কম হয়। যে খেয়াল ভালো গায়, সে হয়তো ঠিকমতো কীর্ত্তন গাইতে পারে না। যে কীর্ত্তন গায়,সে হয়তো ঠিকমতো গজল গাইতে পারে না। যে ভালো ঠুংরী গায়, সে হয়তো ঠিকমতো ধ্রুপদ - ধামার গাইতে পারে না। কিন্তু যিনি যেটা গান, অর্থাৎ সংগীতের যে ধারাটি যিনি বেছে নিয়েছেন, তাতে হয়তো তিনি একেবারে অথরিটি। তার লাইনে স্বাভাবিক কারণেই তিনি জনপ্রিয় শিল্পী। সবকালেই শিল্পীদের সম্পর্কে একথাটা হয়তো সমানভাবে সত্য। কাকার সমসাময়িক কালও এর ব্যতিক্রম নয়। সেই প্রেক্ষাপটে কাকা যখন নিজের প্রশ্নাতীত যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে সংগীতের প্রত্যেক ধারাতেই তিনি সমান পারদর্শী এবং যখন যেটা গাইতেন, তখন সে ধারার অবিসংবাদিত অথরিটি হয়েই গাইতেন। তখন সমস্ত ধারার জনস্বীকৃতি মিলে তিনি যে সামগ্রিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, সেটা অনায়াসেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর সমকালীন যে কোন শিল্পীর একক ধারার আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তার মাপ কাঠিকেও। দ্বিতীয় ফ্যাক্টর,কাকার ঐ রকম স্টেনটোরিয়ান ভয়েস।তখনও তো মাইক ইত্যাদির তেমন প্রচলন হয়নি। শিল্পীরা খালি গলায় এমন গাইত যে বহুদূর থেকেও লোকে সে গান শুনতে পেতো। কিন্তু অন্যদের সাথে কাকার একটা পার্থক্য ছিল এই যে,উদাত্ত কন্ঠের পাশাপাশি কাকার কন্ঠে একটা অদ্ভুত রকমের 'মিঠাসও' ছিল। যেটা অন্যদের গলায় তেমনভাবে ছিলনা। যে কারণেই কাকা যখন

ঐরকম উদাত্ত গলায় গান ধরতেন '' নেচেছ প্রলয় নাচে হে নটরাজ / নটনাচ তা থৈ তা থৈ /বাজে গাল ববম ববম / হাতে ভালে ডম্বরু ঐ '' কিংবা '' আঁধারের ডম্বরু তালে /জেগে ওঠে মরনের গান / কেঁদে বলে আলোকের শিশু/হে ভগবান,গান হারাদের দেহো গান / প্রাণ হীনে দেহো আজ প্রাণ''তখন ডেফিনিটলি সে গান অন্যরকম একটা রূপ পেয়ে যেত। গান শুনলেই গানের ছবিটা একেবারে চোখের ওপর জীবন্ত হয়ে উঠত যেন। ঠিক সেই একই কারণে স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে তাঁর গাওয়া মোহিনী চৌধুরীর লেখা গান '' মুক্তির মন্দির সোপান তলে / কত প্রাণ হল বলিদান '' গানটিও রাতারাতি স্বদেশীদের মধ্যে একেবারে ঝড় বইয়ে দিয়েছিল।

তৃতীয়ত,সংগীতে কাকার ঐ নতুনের খোঁজ। কাকা যখন গান বাজনার জগতে আসেন , বাংলায় তথা সারা ভারতেই তখন বেশ একটু ভারী চালের গান বাজনা চলত। ধ্রুপদ-ধামার,খেয়াল, টপ্পা এগুলোরই তখন প্রায় একচেটিয়া বাজার। অন্যদিকে ধর্মপ্রাণ মানুষদের মধ্যে চলত কীর্ত্তন ইত্যাদি গান। কিন্তু মুস্কিল ছিল এই যে,শাস্ত্রীয় সংগীত তখনও বাবুদের বৈঠক খানা পেরিয়ে জনগণের বস্তু হয়ে ওঠেনি। হলেও শাস্ত্রীয় সংগীতের মার পেঁচ বা হালচাল না জানা সাধারণ মানুষের কাছে ওগুলো দুর্বোধ্য তথা ক্লান্তিকরই থেকে গেছে চিরকাল। রবীন্দ্রসংগীত বা ঐ ধরনের গানও তেমন প্রচার পায়নি তখনও। বা পেলেও মুস্টিমেয় লোকের মধ্যেই সীমিত ছিল সে গান। কাকার ক্ষেত্রে সেটাই হয়ে উঠেছিল একটা মস্তবড় advantage কাকা ধ্রুপদ- ধামার খেয়াল থেকে শুরু করে কীর্ত্তন, গজল সমস্ত ধারার গানই খুব ভালোভাবে শিখেছিলেন ঠিকই , কিন্তু উনি যখন প্রফেশনালি গান বাজনার লাইনে চলে এলেন, তখন সে সময়কার গান বাজনার ঐ ব্যাপারটা উনি খুব স্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তখনই শুরু হয়ে গেল গান বাজনার ক্ষেত্রে ওনার ঐ নতুনের খোঁজ। উনি এমন গানের খোঁজ করতে লাগলেন, যে গান প্রত্যেকের ভালো লাগতে বাধ্য। তখনই উনি ভাবতে লাগলেন শাস্ত্রীয় সংগীতকে ভেঙ্গে কি করে সেই সুরে সহজ বাংলা কথাকে রূপ দেয়া যায়, কি করে ঠুংরীর মেজাজটাকে কাজে লাগিয়ে আবেদনধর্মী বাংলা গান তৈরী করা যায়,কী করে কীর্ত্তনকে সবার ভালো লাগার মতো করে গাওয়া যায়, এসবগুলো তিনি খুব ভাবতে লাগলেন। এভাবেই তৈরী হয়েছিল তাঁর গাওয়া ' ঘন অম্বরে মেঘ সমুদ্র ', 'মন কুসুমের রঙ্ ভরা এই পিচকারিটি রাধে ',' সই লো আমার গঙ্গা জল ',' গেঁথেছি এই ফুলের মালা ' ইত্যাদি অসংখ্য জনচিত্তজয়ী কালজয়ী গান। যতদূর জানি ' চাঁদ বলে কাছে এসো '/'নতুন রাখাল কোন সুরে গাও' ইত্যাদি গান গেয়ে কাকাই বোধহয় এদেশে প্রথম হারমোনাইজড্ ওয়েতে বাংলা গান গাওয়ার প্রচলন করেছিলেন।

চতুর্থত,' যাও যাও মেরে সাধো রহো গুরুকে সঙ্গ', 'বাবা মনকে আঁখে খোল ' বা ' তেরি গঠরিমে লাগা চোর মুসাফির জাগ জরা ' ইত্যাদি নিখুঁত

হিন্দী গান , নিখুঁত উর্দু কাওয়ালি ,নাৎ ইত্যাদি গেয়ে কাকার সর্বভারতীয় স্বীকৃতি আদায় করে নেয়া ।তাঁর আগে কোন বাঙ্গালীকে এত নিখুঁত হিন্দী-উর্দু গান গাইতে আমি অন্তত কখনো শুনিনি । কাকার গান শুনে হিন্দী ভাষীরা সব সময় বলতেন ,- " সুরদাসজী, আপ বঙ্গালী হোতে হুয়ে ভি ইতনি বেহতরিন হিন্দী - উর্দু গানা ক্যায়সে গা লেতে হ্যায় ! " এই সমস্ত কিছু মিলেই কাকার জনপ্রিয়তা সেদিন সারা ভারতবর্ষে ওরকম ধুন্ধুমার কান্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিল । এই সমস্ত কিছু কারণেই HMV এর পক্ষ থেকেও সঙ্গীত উপকথার রাজকুমার , সুর মায়ালোকের রূপকুমার' বলে সেদিন তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছিল । হয়তো কাকার মতো ওরকম গলা আমার নেই , হয়তো ওঁর মতো ওরকম গান আমি গাইতে পারি না , কিন্তু তাঁর মতো ঐরকম সব কিছু গাওয়ার, সব কিছু গাইতে পারার একটা তাগিদ সব সময় আমি নিজের মধ্যে অনুভব করি । এটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে এমন একজন বহুমুখী প্রতিভাধর শিল্পীর সঠিক মূল্যায়ন আজও এদেশে তেমন ভাবে হল না । না সরকারী মহলে , না বেসরকারী মহলে, কোন মহলেই নয় । খুব স্বপ্ন ছিল কাকার স্মৃতিতে কলকাতায় একটি সংগীত ভবন স্থাপনের , সেই নিয়ে এক টুকরো জমির জন্য রাজ্য সরকারের কাছে বহুবার লেখালেখি করে করে আজ আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি । তবু ইচ্ছে আছে নিজের সীমিত সামর্থে হলেও কাকাকে নিয়ে কলকাতায় কিছু একটা করার ।